ট্র্যাডিশন

সুব্রত রায়

সকাল সাড়ে দশটার কিছু পরে একটা দুধ-সাদা মারুতি অল্টো ইন্সটিটিউটের পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়ালো। বাঁ-দিকের দরজা খুলতে খুলতে প্রফেসর বাগচী ড্রাইভারকে বললেন - বাড়ি চলে যাও। ম্যাডাম গাড়ি নিয়ে বেরোবেন। দুপুরে ফিরে এসে আমাকে একটা মিস-কল দিও।

কিছুকাল যাবত প্রফেসর বাগচী প্রায় দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে থাকেন। প্রমাণ করতে চান বুড়ো হন নি। ঘরের দরজা খুলে সব আলোগুলি জ্বালিয়ে দিলেন। বসবার টেবিলের সামনে ও পিছনে দুটো টিউব লাইট। বাঁ-দিকে একটা বড় কাঁচের সবুজ রঙের বোর্ড। তাতে কিছু অঙ্ক কসা আছে। বোর্ডের উপরে আর একটা টিউব। কয়েক মাস ধরে চোখে কম দেখছেন। ছানি পড়া শুরু হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন অতিরিক্ত আলো জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতে। ছোট অক্ষর পড়তে বেশ কষ্ট হয়। বাড়িতে একটা আলো লাগানো ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স আছে। অফিসে অবশ্য কখনও লেন্স ব্যবহার করেন না।

টেবিলের উপর একটা ল্যাপটপ। ডানদিকে আর একটা ছোট টেবিলের পরে একটা ডেস্কটপ কম্প্যুটার। বাড়িতেও একটা ল্যাপটপ আর একটা ডেস্কটপ। কয়েক বছর আগে বিদেশে গিয়ে একটা ল্যাপটপ হারাবার পর থেকে প্রফেসর বাগচী কাঁধে ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরা একদম পছন্দ করেন না। নিয়ম অনুসারে ল্যাপটপ হারালে তার দাম ইন্সটিটিউটকে দিতে হয়। প্রফেসর বাগচী এখনও তা করে উঠতে পারেন নি। সে মডেল এখন আর পাওয়াও যায় না। এখন সেই দামে তার চেয়ে অনেক ভালো তিনটে ল্যাপটপ পাওয়া যায়। একবার ভেবেছিলেন একটা ল্যাপটপ কিনে দিলে অল্পের উপর দিয়ে যেতো, গুনতিতে মিলে ঠিক থাকতো। পরে ভাবলেন ল্যাপটপের আয়ু পাঁচ বছর ধরা হয়। কেনার পর থেকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করলে ওটাকে রাইট-অফ করে দেওয়া যেতে পারে।

ল্যাপটপের ডালা খুলে একটু অপেক্ষা করতে ইন্টারনেট চালু হয়ে গেল। মেল খুলে দেখলেন একটা মাত্র মেল এসেছে, ডিরেক্টরের সেক্রেটারি মণিশংকরের কাছ থেকে। মণিশংকর সবিনয়ে জানিয়েছেন আজ দুটোর সময় ডিরেক্টর অপেক্ষা করবেন। প্রফেসর বাগচী যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। প্রফেসর বাগচী বুঝতে পারলেন এই বিনয়টা মণিশংকরের নিজস্ব। ডিরেক্টর নিজে মেল করলে অবশ্যই ভাষাটা অনেক অন্যরকম হতো। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি ডিরেক্টরকে চেনেন। এখনকার ডিরেক্টর তখন একজন ছাত্র। প্রফেসর বাগচীর মনে হলো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সেটা কি ভেবে পেলেন না। বুককেসের দিকে তাকাতে উপরের

তাকে চোখে পড়লো গত কয়েক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট। গত তিন বছরে কি লিখেছেন চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক, প্রফেসর বাগচী ভাবলেন। প্রথমটা খুলে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। কয়েক লাইন তাঁর কাজের ফিরিস্তির পর লেখা আছে - see my CV। মনে হয় বিদেশ থেকে কোনো ছাত্রকে বলেছিলেন CV থেকে কিছুটা টুকে জমা দিতে। ক্লাস সিক্স থেকে ইংরাজি পড়তে সুরু করা আজকালকার ছাত্রদের ইংরাজি জ্ঞান বড়ই কম। তাই যা লিখে দিয়েছিলেন সেটাই ছাপতে দিয়ে দিয়েছে। তবে সৌভাগ্যের কথা অ্যানুয়াল রিপোর্ট বড় একটা কেউ পড়ে না। প্রফেসর বাগচী চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিলেন। আজ কেমন একটু অস্থির লাগছে। দুটো বাজতে অনেক দেরি। এক কাপ চা পেলে ভালো হতো। ক্যান্টিনে যাওয়া অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছেন। সাড়ে এগারোটার সময় ঘরে ঘরে চা আসে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কলেজে ঢুকে শিখেছিলেন যে কোনো একক-কে ভর, দৈর্ঘ্য ও সময়ের বিভিন্ন ঘাত দিয়ে বর্ণনা করা যায়। কয়েক বছর আগে বুঝেছিলেন বিদ্যাবত্তা মাপার জন্য নতুন কিছু একটা দরকার। ততদিনে বিদ্যাবত্তা মাপার পদ্ধতি এসে গেছে। তার নামকরণ হয়েছে H-index। মোটা কথায় অন্য বিজ্ঞানীরা বেশি বেশি তাঁর পেপার নিজেদের পেপারে রেফার করলে H-index বাড়তে থাকে। প্রফেসর বাগচী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি লক্ষ্য করেছেন চিন জাপানের কোনো ক্ষমতাবান উঁচুপদে থাকা বিজ্ঞানীর সঙ্গে যদি কয়েকটা পেপার লেখা যায়, তাহলে সে দেশের অলিখিত নিয়ম অনুসারে সেই ল্যাবের সবাই বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির ছাত্ররা বা তাঁর কাছে যারা সুবিধা পেতে চায়, যা পেপার লিখবে সব পেপারে বসের পেপার রেফার করতে বাধ্য থাকবে দরকার থাকুক আর না থাকুক। ফলে H-index হু হু করে বাড়তে থাকে। তাই গত কয়েক বছর ধরে প্রফেসর বাগচী চিন জাপান যাওয়া বেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এত করেও নিজের H-index ছাব্বিশের উপর তুলতে পারেন নি। আজকাল তাঁকে বলতে শোনা যায়, চল্লিশ H-index হয়ে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে অথচ আশি H-index বিজ্ঞানীকে কেউ পাত্তা দেয় না। তাই H-index ব্যাপারটা একদম ফালতু।

প্রফেসর বাগচী চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছেন খেলার নিয়ম ঠিক হবে কে খেলছে তার উপর। যে বছর বেশি পেপার হতো না তখন বলতেন, সংখ্যা দিয়ে কাজের বিচার করা যায় না। আসল হচ্ছে কোয়ালিটি। আবার যে বছর বেশি পেপার হতো তখন বলতে শোনা যেতো বছরে আট-দশটা পেপার না হলে আবার কি রিসার্চ হলো? অপছন্দের কেউ ভালো পত্রিকায় পেপার ছাপলে বলতেন, আজকাল জার্নালগুলির স্ট্যান্ডার্ড বলতে আর কিছু নেই।

বারোটা নাগাদ ড্রাইভার মিস-কল দিলো। প্রফেসর বাগচী ঘর বন্ধ করে চিন্তিত মুখে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেবে পার্কিং-লটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বাড়ি চলো, ড্রাইভারকে বললেন। লাঞ্চ করে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে যখন ফিরলেন তখন দেড়টা বাজে।

* * * * * *

প্রফেসর দাশগুপ্ত দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়িতে সাড়ে দশটা। আজ তাঁর পোস্ট অফিস থেকে এম-আই-এসের সুদ পাবার দিন। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দরজা খুলে বেরোবেন এমন সময় ফোন বেজে উঠলো।

- স্যার আমি মণিশংকর বলছি। আপনি কেমন আছেন?
- আরে মণিবাবু! অনেকদিন পর আপনার গলা শুনলাম। আমি ভালো আছি। আপনার খবর কি?
- ভালো। এদিকে কবে আসছেন?
- আপনাদের ওদিকে যাওয়ার দরকার পড়ে না। তাই অনেকদিন যাওয়া হয় নি।
- ডিরেক্টর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি এদিকে এলে একবার কি এখানে আসতে পারবেন?

প্রফেসর দাশগুপ্ত একটু ভেবে বললেন - সামনের বুধবার আপনাদের কাছাকাছি যাব। তখন একবার ঘুরে আসতে পারি। মণিশংকর বললেন - স্যার, কটা নাগাদ আপনি এদিকে আসবেন? দাশগুপ্ত বললেন - ধরুন একটা নাগাদ। মণিশংকর বললেন - ঠিক আছে স্যার। ভালো থাকবেন।

নভেম্বর মাস। বছরে একবার ব্যাঙ্কে মুখ দেখাতে হয়, "বেঁচে আছি" প্রমাণ দেবার জন্য। দাশগুপ্ত ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে নিজের পুরানো অফিসের বন্ধ বড় গেটের পাশের ছোটো গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা বাজে। দাশগুপ্তকে দেখে মণিশংকর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন - ভিতরে স্যার আছেন, চলে যান। দাশগুপ্ত দরজার টোকা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল টেবিলের একদিকে ডিরেক্টর বসে আছেন। দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, ডিরেক্টর বসতে বলবেন এই অপেক্ষায়। তারপর নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন - দু-বছর আগে পা থেকে অনেকগুলি শিরা কেটে বুকের খাঁচার মধ্যে লাগানো হয়েছে। তাই এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। ডিরেক্টর চোখ তুলে বললেন - সরকার থেকে বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেছে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য। একটা কমিটি করতে হবে। তাতে অন্তত বাইরের তিন জনকে রাখতে হবে। আমি আপনার নাম পাঠিয়ে দিয়েছি। দাশগুপ্ত বললেন - পাঠিয়ে দিয়েছেন? আমাকে জিজ্ঞাসা না করে? ডিরেক্টর সোজা হয়ে বসে বললেন - খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনি আমাদের ই-মেল ছেড়ে দিয়েছেন, অন্য ই-মেল ব্যবহার করেন। তাই কাগজপত্র পাঠাতে পারিনি। এই ফাইলে সব কাগজপত্র আছে। বাড়ি গিয়ে দেখে নেবেন। দাশগুপ্তর ঠোটের ফাঁক দিয়ে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিলো। বললেন - যাদের কাছ থেকে আমি

ইন্সটিটিউটের ই-মেল ছেড়ে দিয়েছি জানতে পেরেছেন তাদের জিজ্ঞাসা করলেই আমার বর্তমান ই-মেলটা জানতে পারতেন। আপনার সেক্রেটারি মণিশংকর আমার এখনকার ই-মেলটা জানে। গত ছ-মাসে বার তিনেক আমাকে ই-মেল করেছে। তাছাড়া আমার নিজের একটা ওয়েব-পেজ আছে। গুগুলে আমার নাম দিলেই তার হদিশ পাওয়া যায়। আপনার স্মরণে আছে কিনা জানিনা, ছাত্রদের দিয়ে একবার লিখিত অভিযোগ করানো হয়েছিল - কেন আমার ওয়েব-পেজে আমার স্ত্রীর ছবি দিয়ে ইন্সটিটিউটের ডিস্ক-স্পেস নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু কর্তাদের খেয়াল ছিল না ইন্সটিটিউটের ওয়েব-পেজ তৈরি হবার বেশ কয়েক বছর আগে থেকে আমার ওয়েব-পেজ বিদেশের কোনো একটা কম্প্যুটারে আছে, যেখানে ডিস্ক-স্পেস বিনে পয়সায় ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। ডিরেক্টর বললেন - যাকগে। সামনের সপ্তাহে একটা মিটিং ডেকে ফেলি? একটু তাড়া আছে। টাকাটা মার্চ মাসের মধ্যে খরচ করতে হবে। তাছাড়া সামনের মাসে আমার ক-দিনের জন্য বিদেশ যাওয়ার কথা আছে। দাশগুপ্ত বললেন - দাঁড়ান। আমি অবসর নিয়েছি চার বছরের বেশি হয়ে গেল। এই দীর্ঘ চার বছরে বিজ্ঞান, বিশেষ করে যন্ত্রপাতি আরও আধুনিক হয়েছে। সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। ডিরেক্টর বললেন - আপনাকে তেমন কিছু করতে হবে না। আমরা সব কিছু করে দেবো। আপনি শুধু সই করে দেবেন। দাশগুপ্ত বললেন - খুবই দুঃখিত হলাম। আপনি আমাকে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করতে চান? আমি যখন এখানে কাজ করতাম তখন না জেনে বা না বুঝে কোনো যন্ত্র কখনও কিনি নি। ডিরেক্টর বললেন - তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন, কমিটিতে থাকবেন না? প্রতি মিটিং-এ আসার জন্য এক হাজার টাকা ফি দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছে। বুঝলেন ডিরেক্টর সাহেব, ডাক্তার আমাকে রেড-মিট খেতে বারণ করেছে। তাই পাঁঠার মাংসের দর ঠিক জানিনা। শুনেছি কেজি তিনশ টাকার মতো। ছোটোবেলায় শুনতাম মরা হাতির দাম লাখ টাকা। মরা মানুষের দাম কতো বলতে পারেন? পারলেন না তো। চুল্লু খেয়ে মরতে পারলে সরকার থেকে দু-লাখ দশ হাজার টাকা দিচ্ছে। আর আপনি আমাকে হাজার টাকার লোভ দেখাচ্ছেন, দাশগুপ্ত বললেন। শুনেছি মাস দুয়েক আগে দেড় কোটি টাকা দামের একটা যন্ত্র কেনা হয়েছে। আড়চোখে সাইড টেবিলে রাখা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বললেন - লোকমুখে শুনেছি যন্ত্র কেনার মধ্যে ছিলেন সেই দু-জনকে কোম্পানি একটা ল্যাপটপ আর একটা ভিডিও ক্যামেরা উপহার দিয়েছে। আর সামনের মাসে জার্মানিতে একটা কনফারেন্স-এ যাওয়া স্পন্সর করছে। ডিরেক্টরের মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললেন - আপনি আমাদের এখান থেকে পেনশন পান না? আমি ইচ্ছা করলে সেটা বন্ধ করে দিতে পারি জানেন? দাশগুপ্ত এবার হেসে ফেললেন। এতক্ষণ হাতদুটো জড়ো করে কনুই চেয়ারের হাতলে রেখে বসেছিলেন। এবার দু-হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো ধরে পিঠটা চেয়ারের পিছনে ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ঘাড়টা বাঁ-দিকে সামান্য হেলিয়ে বললেন - আমি যে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি সেখানে একজন সত্যিকারের পালোয়ান থাকে। এশিয়ান গেমস্ থেকে কুস্তিতে সোনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু পাড়ার ছেলে, বুড়ো কেউ তাঁকে ভয় পায় না। যদিও আমি জানি ইচ্ছা করলে সে আমাকে বারান্দা থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ভয় কারা দেখায় জানেন? যারা নিজেরা ভয় পায়।

প্রফেসর দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন - অবশ্যই আপনি আমার পেনশন বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন যে কলম দিয়ে আপনি পেনশন বন্ধ করার অর্ডার দেবেন সেই কলম দিয়ে আবার পেনশন চালু করার অর্ডার কি করে বার করতে হয় তা আমি ভালো করে জানি। আর আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় আমার হাত কতটা লম্বা।

প্রফেসর দাশগুপ্ত ডিরেক্টরের অফিস থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। লম্বা করিডরের মাঝখানে সিঁড়ি। চোখ তুলতে দেখলেন করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে প্রফেসর বাগচী সিঁড়ির দিকে আসছেন। একসময় তাদের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। প্রায় বারো বছর হলো সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। প্রফেসর দাশগুপ্ত মনে করার চেষ্টা করলেন শেষ কবে প্রফেসর বাগচীর মুখ দেখেছেন। করিডরের ও-মাথার ডান দিকের প্রথম দরজায় লেখা জেন্টস্। প্রফেসর বাগচী চোখ তুলে প্রফেসর দাশগুপ্তকে দেখতে পেয়ে সেই দরজা ঠেলে টয়লেটে ঢুকে পড়লেন। প্রফেসর দাশগুপ্ত সিঁড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, কি ভেবে সিঁড়ির উল্টোদিকের লিফটের বোতাম টিপলেন। আজ আর সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছা করছে না। এক সময় ছিল যখন তিনি লিফট কখনও ব্যবহার করতেন না। দিন বদল হয়েছে। এক্সট্রা টাইম সুরু হয়ে গেছে। উপরের আম্পায়ার যে কোনোদিনই আঙুল তুলতে পারেন। এখানে থার্ড আম্পায়ার নেই। নেই কোনো ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করে না। গেটের বাইরে এসে দেখলেন একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত তিনি ট্যাক্সি চড়েন না। আজ শরীর ও মন দুই-ই বড় ক্লান্ত লাগছে। ট্যাক্সির দরজা খুলতে খুলতে বললেন - বেহালা চৌরাস্তা।

* * * * * *

প্রফেসর বাগচী ধীর পায়ে লম্বা করিডর পার হয়ে ডিরেক্টরস্ এনক্লোজারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে তাঁর সময়ে এটা তৈরি হয়েছিল। ভেবেছিলেন আরও বেশ কিছুদিন এই তাজমহল ব্যবহার করতে পারবেন। দিল্লি থেকে সে-রকম আশ্বাস মিলেছিলো। কিন্তু অবস্থার চাপে ডিরেক্টর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তারপর চার বছর কেটে গেছে। অবসর নেবার পর এমারিটাস প্রফেসর হয়ে তিন বছর কাটিয়ে দিলেন। আগামীকাল তার শেষ দিন। ডিরেক্টর কেন তাঁকে তলব করেছেন বুঝতে পারছেন না। বেশ কয়েক বছর ধরে ডিরেক্টরের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে এসেছেন। নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। দুজনে একজোট হয়ে প্রফেসর সুমন্ত মুখার্জী আর প্রফেসর অঞ্জলি নাগ যাতে ইন্সটিটিউটে কাজ করতে না পারেন তার চেষ্টা করে গেছেন। একসময় বাধ্য হয়ে প্রফেসর মুখার্জী আর প্রফেসর নাগ ইন্সটিটিউট ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য "আমি তোমাদের লোক" বিপ্লবী কথাবার্তা বলে সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টাও করেছেন। তবে কি তাঁকে নতুন কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে? প্রফেসর বাগচী চিন্তিত মুখে ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে দেখলেন

সেখানে রেজিস্ট্রারও বসে আছেন। তাঁদের মুখ থমথমে। সামনের শূন্য কফির কাপ। মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা অপেক্ষা করছেন।

- আশিস্‌দা, আপনার টার্ম আগামীকাল শেষ হচ্ছে। আমাদের এখানে ঘরের খুব টানাটানি। আপনি যদি কাল বিকেল চারটার মধ্যে আপনার ঘরটা ছেড়ে দেন তাহলে ভালো হয়, ডিরেক্টর বললেন।
প্রফেসর বাগচী এটা আশা করেন নি। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন - আমি এখানে ফ্যাকাল্টি হিসাবে পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলাম। একদিনের মধ্যে ঘর খালি করা আমার পক্ষে অসম্ভব।
- আশিস্‌দা, আপনার ঘরে তো আছে কাগজপত্র আর একটা ডেস্কটপ কম্প্যুটার। ক্যাম্পাসে নতুন যে বাড়িটা উঠেছে তাতে আপনি একটা ঘর ছ-মাসের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। রেজিস্ট্রারকে বলে দিয়েছি, আপনাকে দু-তিন জন লোক দেবেন। জিনিষপত্র সরাবার জন্য। আপনার কাগজপত্র, আলমারি, বুককেস, কম্প্যুটার সব পাশের বাড়িতে ওরা গুছিয়ে দিয়ে আসবে।
রেজিস্ট্রার প্রফেসর বাগচীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।
- আমার পোস্টে এখনও লোক নেওয়া হয় নি। এখুনি কেন ঘরের দরকার হয়ে পড়লো?
- এটা আমাদের পলিসি। আপনাকে কাল ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আমি আপনার পলিসি ফলো করছি মাত্র।
- আমার পলিসি?
- কেন, আপনি প্রফেসর দত্তগুপ্তকে অবসর নেবার দিন ঘর ছেড়ে দিতে বলেন নি? ঘর না ছাড়লে টাকা পয়সার চেকগুলি আটকে রাখা হবে বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। প্রফেসর দত্তগুপ্ত ঐ দিনই পাশের একটা ছোটো ঘরে তাঁর জিনিষপত্র সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক-দিন পর সেই ঘরটাও আপনি ওঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।
- এ দুটো কেস এক হলো না। আমার পক্ষে কালকের মধ্যে ঘর ছাড়া সম্ভব নয়।
- কিছুক্ষণ আগে আমি একটা অফিস অর্ডার দিয়েছি। কাল বিকেলের ছটার মধ্যে আপনি ঘর ছেড়ে না দিলে আপনার সব জিনিষপত্র ঘর থেকে বার করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ঘরে তালা দিয়ে দেওয়া হবে। তখন আপনার জিনিষপত্রের দায়িত্ব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেবে না। আচ্ছা। Thank you।

প্রফেসর বাগচী আস্তে আস্তে ডিরেক্টরের ঘরের বাইরে দাঁড়ালেন। M.Sc পাস করে যখন এখানে ছাত্র হিসাবে এসেছিলেন তারপর চার দশকেরও বেশি কেটে গেছে। জীবনে নোবেল প্রাইজ পাওয়া ছাড়া আর পাওয়ার বোধহয় কিছু বাকি নেই। অর্থ, প্রতিপত্তি, দেশের সমস্ত অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ, অসংখ্য অ্যাওয়ার্ড, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিগ্রি, আড়াইশোর উপর পেপার। গত তিরিশ বছরে অন্তত দেড়শো বার বিদেশ গেছেন। যৌবনের

সুরুতে দু-একটা ভালো কাজ করে বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তারপর শুধু হাতল ঘুরিয়ে পেপার লিখে গেছেন। নজর শুধু ছিল ক্ষমতা অর্জন করার। কিন্তু কালের বিচারে কি তাঁর কোনো কাজ স্থান পাবে? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। আজকে তিনি একা। এখানে তাঁর কোনো বন্ধু নেই। সবাই আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছে। মনে পড়লো স্কুলের বাংলা বইতে পড়া ওয়াজেদ আলীর গল্প ভারতবর্ষের শেষ লাইনটা - সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলেছে!

January-February, 2012